গোল্ড ইজ মানি

স্বর্ণ, কাগুজে টাকা, বৈশ্বিক মুদ্রাযুদ্ধ ও কিছু অজানা সত্য

নতুন প্রজন্মের প্রকাশনা
ইন্তিফাদা
বুকস

গোল্ড ইজ মানি

স্বর্ণ, কাগুজে টাকা, বৈশ্বিক মুদ্রাযুদ্ধ ও কিছু অজানা সত্য

মূল	জেমস রিকার্ডস
অনুবাদ ও সম্পাদনা	রাকিবুল হাসান
প্রথম প্রকাশ	বইমেলা, ২০২২ খ্রিষ্টাব্দ
প্রচ্ছদ	সিদ্দিক মামুন
মুদ্রণ	সপ্তম মুদ্রণ
স্বত্ব	প্রকাশক
প্রকাশক	আবদুর রহমান আদ-দাখিল
প্রকাশনা	ইন্তিফাদা বুকস
পরিবেশনা	ফাউন্টেন পাবলিকেশন্স
বিক্রয়কেন্দ্র	দোকান নং ২১, কওমি মার্কেট ১ম তলা, ৬৫/১ প্যারিদাস রোড, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০ ফোন: +৮৮০ ১৭৬৮-৮৬৪৪২৮ (সেলস) +৮৮০ ১৭৮৯-৮৫৪৬০২ (অফিস)
অনলাইন পরিবেশক	rokomari - wafilife - boisodai
আইএসবিএন	৯৭৮-৯৮৪-৯৬৮৭৫-৫-৯

মুদ্রিত মূল্য : ২৭০ ৳

উৎসর্গ

মুফতি শাব্বির আহমদ
যার দারস আমার অর্থনীতির হাতেখড়ি!

©
লেখক ও প্রকাশকের লিখিত অনুমতি ছাড়া এ বইয়ের কোনো অংশের প্রতিলিপি বা পুনরুৎপাদন করা যাবে না, কোনো ধরনের যান্ত্রিক উপায়ে প্রতিলিপি করা যাবে; এ শর্তের লঙ্ঘন আইনি দৃষ্টিকোণ থেকে দণ্ডনীয় অপরাধ বলে বিবেচিত হবে।

সূচি

প্রকাশকের কথা/১১
অনুবাদকের কথা/১৫

প্রথম অধ্যায়

এক চুমুকে মুদ্রার ইতিহাস

বিনিময় প্রথা/১৭
কড়ি/১৭
পয়সা/১৮
কাগুজে অর্থ/১৮
গোল্ড স্ট্যান্ডার্ড/২০
টার্নিং পয়েন্টস : জিনোয়া কনফারেন্স/২০
ব্রেটন উডস/২১
পেট্রোডলার/২৩

দ্বিতীয় অধ্যায়

বিশ শতক : মুদ্রাস্ত্র ও মুদ্রাযুদ্ধের ইতিবৃত্ত

যদি সহসাই টাকার মূল্য কমে যায়?/২৭
ক্লাসিক্যাল গোল্ড স্ট্যান্ডার্ড (১৮৭০-১৯১৪)/২৯
প্রথম মুদ্রাযুদ্ধ (১৯২১-১৯৩৬)/৩১
দ্বিতীয় মুদ্রাযুদ্ধ (১৯৬৭-১৯৮৭)/৩৩

তৃতীয় অধ্যায়

স্বর্ণবিরোধীদের যুক্তিখণ্ডন

স্বর্ণ কি বর্বরযুগের স্মৃতিচিহ্ন?/৩৭
অর্থায়ন ও বাণিজ্য পরিচালনার মতো যথেষ্ট স্বর্ণ মজুত নেই?/৪১
বিশ্বপ্রবৃদ্ধির সাথে তাল মিলিয়ে স্বর্ণ দ্রুত বর্ধনশীল নয়?/৪৩
স্বর্ণের কারণে অর্থনৈতিক মহামন্দা দেখা দিয়েছিল?/৪৫
স্বর্ণের প্রবৃদ্ধি নেই?/৪৭
স্বর্ণের স্বকীয় মূল্য নেই?/৪৮
স্বর্ণের পক্ষে/৫১

চতুর্থ অধ্যায়

স্বর্ণ এবং ফেডারেল রিজার্ভ

ফেডারেল রিজার্ভ কি মরে গেছে?/৫৩
বাংলাদেশের অর্থ সরবরাহ ব্যবস্থা/৫৮

পঞ্চম অধ্যায়

গোল্ড ইজ মানি (স্বর্ণই অর্থ)

অর্থ কী?/৬১
স্বর্ণই কেন?/৬২
স্বর্ণ বিনিয়োগ নয়/৬৪
স্বর্ণ পণ্য নয়/৬৪
স্বর্ণ কাগজ নয়/৬৫
স্বর্ণ ডিজিটাল নয়/৬৭
অর্থব্যবস্থার পতনের ইতিহাস এবং গোল্ড স্ট্যান্ডার্ডের সমাপ্তি/৬৮
স্বর্ণ কখনো মূল্য হারাবে না/৭০
স্বর্ণই অর্থ, অন্যকিছু নয়/৭১
স্বর্ণ ও আন্তর্জাতিক অর্থব্যবস্থা/৭৭
শ্যাডো গোল্ড স্ট্যান্ডার্ড/৮২
উপসংহার/৮৪

ষষ্ঠ অধ্যায়

স্বর্ণই ইনস্যুরেন্স

কমপ্লেক্সিটি মডেল এবং সিস্টেম এনালিসিস/৮৫
আন্তর্জাতিক নেটওয়ার্ক/৮৯
কমপ্লেক্সিটি এবং নীতিনির্ধারণ/৯৩
ফিনান্সিয়ালাইজেশন অব দ্য ইকোনোমি/৯৪
ফেডারেল রিজার্ভের ভূমিকা/৯৫
নীতিনির্ধারণে ফেডের ভূমিকা/৯৫
মুদ্রাস্ফীতি ও মুদ্রাহ্রাসের ইনস্যুরেন্স : স্বর্ণ/৯৭

সপ্তম অধ্যায়

স্বর্ণ পরিবর্তনহীন

স্বর্ণের দাম/১০১
কাগুজে স্বর্ণের দর বনাম বাস্তব স্বর্ণের দর/১০২
স্বর্ণের মূল্যবৃদ্ধি/১০৫
ম্যানিপুলেশন/১০৬
স্বর্ণ ডাম্পিং/১০৬
পেপার ম্যানিপুলেশন/১০৭
হেজ ফান্ড (Hedge Fund) ম্যানিপুলেশন/১০৮
আন-অ্যালোকেটেড স্বর্ণ লিজ/১০৯
কমবাইন্ড ম্যানিপুলেশন/১০৯
অন্তরালে কে?/১১০
ম্যানিপুলেশনরোধ/১১২

অষ্টম অধ্যায়

স্বর্ণ স্থিতিস্থাপক

সাইবারফিনান্সিয়াল ওয়ার/১১৫
ডলার পরিত্যাগ/১১৭
ডলারের দাদাগিরি/১১৮
উদীয়মান বাজারের ভূমিকা/১২২
নৈরাজ্য ও পতন/১২৩
সম্ভাব্য বেইল ইন/১২৪
বাজেয়াপ্তকরণ এবং উয়িন্ডফল প্রফিট ট্যাক্স/১২৪
ক্যাশ ওয়ার/১২৮
প্রেক্ষিত বাংলাদেশ/১৩১
উপসংহার/১৩২

নবম অধ্যায়

স্বর্ণসঞ্চয় পদ্ধতি

স্বর্ণের বাজার/১৩৩
সংরক্ষণ/১৩৪
স্টকমার্কেটের স্বর্ণ/১৩৬
স্বর্ণ ও স্টকমার্কেটের আন্তঃসম্পর্ক/১৩৭
উপসংহার/১৩৯

প্রকাশকের কথা

বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা সাইয়িদিনা মুহাম্মদ। অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এই বইটি প্রকাশ করার পূর্ব মুহূর্তে আমি বিগলিত হৃদয়ে মহান আল্লাহর প্রশংসা করছি, যার তাওফিক ছাড়া কোনো কাজ সম্পাদন করা সম্ভব নয়।

খুব সম্ভবত এই বইটি প্রকাশের সবচেয়ে উপযুক্ত সময় এটি, যা আমরা এখন অতিক্রম করছি। মার্কিন আইনজীবী ও নিউইয়র্ক টাইমস বেস্টসেলার রাইটার জেমস রিকার্ডস *The New Case for Gold* নামে বইটি লিখেছেন ২০১৬ সালে। তবে সেই সময়ে বসে তিনি যেসব ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন তার অনেক কিছুই এখন; বিশেষত বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে ক্রমশ স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

বাংলাদেশের যেকোনো সময়ের চেয়ে নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির হার এখন অনেক বেশি। দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির একটি স্বাভাবিক প্রক্রিয়া রয়েছে, কিন্তু বর্তমানে সেটা আর স্বাভাবিক পর্যায়ে নেই। এই সংকটের কারণ কী? আমরা সহজেই সকল অভিযোগের তির সরকারের দিকে নিক্ষেপ করি, কিন্তু এত সহজ হিসেব-নিকেশ সবখানে চলে না। তা ছাড়া এমন সহজ অভিযোগ পারতপক্ষে আমাদের সমস্যার সমাধানে কার্যকরী কোনো প্রভাব ফেলে না। আসলে যেকোনো সংকট নিরসনের পূর্বশর্ত হচ্ছে সমস্যার গোড়া চিহ্নিত করা, তারপর সে অনুযায়ী উত্তরণের কর্মপন্থা নির্ধারণ করা।

বললে হয়তো অত্যুক্তি হবে না যে, বর্তমান বিশ্বের মুদ্রাব্যবস্থা বা অর্থনৈতিক সিস্টেম কীভাবে চলছে, বাংলাদেশের ৯৯% শিক্ষিত মানুষ এ সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারণা রাখেন না। এমনকি অর্থনীতির ছাত্র, শিক্ষক, প্রফেসর এবং বড় বড় আর্থিক প্রতিষ্ঠানের উচ্চস্তরের কর্মকর্তাদের ব্যাপারেও এমন ধারণা পোষণ করেন জেমস রিকার্ডস। অর্থনীতিতে নানান সংকট ও গোলযোগের পেছনে এই অজ্ঞতাই সবচেয়ে বেশি দায়ী। আমি মনে করি, সাধারণ মানুষ থেকে শুরু করে অর্থনীতির ছাত্র, শিক্ষক এবং আর্থিক প্রতিষ্ঠানে যেকোনো স্তরে কর্মরত আছেন, এমন

সকলেই উপকৃত হবেন বইটি থেকে। আর তখনই আমাদের প্রচেষ্টা সার্থক হবে বলে মনে করি।

বইটি পড়ার আগে অবশ্যই লেখকের সঙ্গে পরিচিত হয়ে নেবেন। কারণ এখানে হয়তো এমন অনেক তথ্যই পাবেন, যা ইউটিউব-ফেসবুকের সস্তা কন্টেন্টে কিংবা কোনো সাধারণ হুজুরের মুখে শুনেছেন এবং যথারীতি অর্থনীতি বিষয়ে তাদের অ্যাকাডেমিক ব্যাকগ্রাউন্ড নেই ভেবে উপেক্ষা করেছেন, হয়তো গতানুগতিক এমন হাজারো বিষয়ের মতো ষড়যন্ত্রতত্ত্ব ভেবেছেন। জেমস রিকার্ডসকে সেই দৃষ্টিতে বিচার করার কারণ নেই। তা ছাড়া লেখক যতটা ভারী আলাপ করেছেন, ততটা ভারী অ্যাকাডেমিক ও প্রফেশনাল ব্যাকগ্রাউন্ড তার আছে কি না, এ বিষয়েও আপনাকে নিঃসন্দেহ হয়ে নিতে হবে।

গত শতাব্দীর পুরো অর্থব্যবস্থা এবং কারেন্সি সিস্টেমকে বিশ্লেষণ করে এই সামগ্রিক ব্যবস্থাকে কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়েছেন লেখক। অর্থের সাথে স্বর্ণের সম্পর্ককে সামনে রেখে কিছু সমস্যা, সম্ভাবনা এবং নতুন চিন্তা উপস্থাপন করেছেন তিনি। সহজভাবে বলতে গেলে স্বর্ণের সাথে সম্পর্কহীনতাকেই প্রচলিত অর্থ ও মুদ্রাব্যবস্থার সকল সমস্যার জন্য দায়ী করেন রিকার্ডস এবং উত্তরণের একমাত্র পথ হিসেবে স্বর্ণভিত্তিক মুদ্রাব্যবস্থা পুনঃপ্রতিষ্ঠার দাবি উপস্থাপন করেন। তিনি মনে করেন যে, তার এই প্রস্তাবনা বর্তমান বিশ্ব মোড়লরা স্বপ্রণোদিতভাবে মেনে না নিলেও খুব শীঘ্রই সময়-ই তাদেরকে তা মানতে বাধ্য করবে। ফলে একজন প্রবীণ বিনিয়োগ উপদেষ্টা হিসেবে তিনি বিনিয়োগ প্রতিষ্ঠানগুলোকে পরামর্শ দেন যে, তাদের সম্পদের কিছু অংশ স্বর্ণে প্রতিস্থাপন করে রাখতে, যেন দুর্যোগের সময় সব হারিয়ে পথে বসতে না হয়। তাই আমি মনে করি, বইটি সাধারণ পাঠকদের জ্ঞানের ভান্ডারে প্রবৃদ্ধি আনলেও বড় বিনিয়োগকারী ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানগুলোই কার্যত এর থেকে বৈষয়িকভাবে বেশি লাভবান হতে পারবেন। অতএব, সাধারণ পাঠকদের কাছে অনুরোধ থাকবে, বইটি আপনার পড়া হলে এমন কারও হাতে পৌঁছে দিন, যিনি বৈষয়িকভাবে এর থেকে উপকৃত হতে পারবেন।

উল্লেখ্য যে, সাধারণ পাঠকদের প্রতি লক্ষ রেখে আমরা বইটির গতানুগতিক ধারার অনুবাদ এড়িয়ে গেছি। লেখকের কথাকে যথাসম্ভব সহজ করার জন্য কিছু অর্থনৈতিক পরিভাষার ব্যাখ্যা এবং বাংলাদেশের

প্রেক্ষাপট অনুযায়ী কিছু উদাহরণ মূল লেখার সাথে সংযোজন করা হয়েছে। তবে নিশ্চিতভাবেই লেখকের চিন্তার বাইরে নতুন কিছু যুক্ত করা হয়নি। জটিল একটি টপিকের এমন সাবলীল ও প্রাঞ্জল অনুবাদের পুরো কৃতিত্ব মননশীল অনুবাদক রাকিবুল হাসান ভাইয়ের প্রাপ্য। আমি তার উত্তরোত্তর সফলতা কামনা করি। নিশ্চয়তার সাথে বলতে পারি যে, অনুবাদ, না মৌলিক লেখা পড়ছেন—পাঠকের উপলব্ধি করতে বেগ পেতে হবে।

সর্বশেষ পাঠকদের বলতে চাই যে, বইটি যদি আপনাদের জ্ঞান বৃদ্ধি এবং বাস্তব জীবনে কিছুটা হলেও কাজে আসে, তাহলেই আমাদের প্রচেষ্টা সফল এবং সার্থক হবে ইনশাআল্লাহ।

বইটি পড়ে ভালো লাগলে অনলাইনে এবং অফলাইনে আপনার অভিব্যক্তি অবশ্যই শেয়ার করবেন। আপনাদের যেকোনো পরামর্শ ও মতামত আমাদের জানাতে ভুলবেন না। বইটিকে আলোর মুখ দেখাতে নানান স্তরে যারা এর সাথে জড়িত ছিলেন তাদের সবাইকে, এবং বিশেষ করে প্রিয় পাঠক আপনাকে, অগ্রিম শুভেচ্ছা জানাচ্ছি।

বিনীত

আবদুর রহমান আদ-দাখিল
ডেমরা, ঢাকা
১৯-০২-২২
addakhil791@gmail.com
fb.com/addakhil791

অনুবাদকের কথা

গোল্ড স্ট্যান্ডার্ড!?

শব্দটা শোনার পর আমার প্রথম এক্সপ্রেশন ছিল—ভ্রুকুঞ্চন। অতঃপর কিছুটা তাচ্ছিল্যভাব। কিন্তু লেখকের বায়োগ্রাফি দেখে সমীহ তাচ্ছিল্যের জায়গা দখল করে নিতে সময় লাগেনি।

জেমস রিকার্ডস নিউইয়র্ক টাইমস বেস্ট সেলার রাইটার। মার্কিন আইনজীবী, ভাষ্যকার, ইনভেস্টমেন্ট বিশেষজ্ঞ। তিন দশকের বেশি সময় ধরে প্রত্যক্ষভাবে বিনিয়োগ, বিনিয়োগ পরামর্শ এবং বড় বড় অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠানে কাজের অভিজ্ঞতালব্ধ। মার্কিন সরকারের গুরুত্বপূর্ণ অর্থনৈতিক নীতিনির্ধারণী বৈঠকের অন্যতম 'অতিথি'।

ফলে পড়তে শুরু করেছি, এবং শেষ করতে করতে সম্পূর্ণ নতুন চিন্তাজগতের সাথে পরিচিত হয়েছি।

অর্থনীতি ও বৈশ্বিক নিরাপত্তা অঙ্গাঙ্গি জড়িত। বিগত শতকে তিনবার বিশ্ব অর্থব্যবস্থা ধসের মুখে পড়েছে। দুইবার তা বিশ্বযুদ্ধে গড়িয়েছে। স্নায়ুযুদ্ধ অবসানের পর অর্থনীতি দেশগুলোর দ্বিতীয় সারির এজেন্ডা থেকে প্রথম সারিতে উঠে এসেছে। স্নায়ুযুদ্ধকালে সব দেশের মনোযোগের প্রধান কেন্দ্রবিন্দু ছিল—নিরাপত্তা, ভৌগোলিক অখণ্ডতা। কিন্তু কোল্ড ওয়ার সমাপ্ত হওয়ার পর অর্থনীতিই হয়ে ওঠে দেশগুলোর মুখ্য চিন্তা। বিশেষত, অর্থনীতিকে হাতিয়ার বানিয়ে চীনের বিস্ময়কর উত্থানের পর 'ইকোনোমি' শুধু উন্নয়নে সীমাবদ্ধ নেই; বরং 'ইকোনোমিক উইপন'-এ পরিণত হয়েছে।

ফলে স্বাভাবিকভাবেই অর্থনীতি, বিশ্বনিরাপত্তায় অর্থনীতির ভূমিকা এবং অর্থব্যবস্থার গুরুত্বপূর্ণ উপাদানগুলো আলোচনায় আসার কথা, কিন্তু আসছে না। কেন? বইয়ের শেষ নাগাদ আপনি উত্তর পেয়ে যাবেন।

বক্ষ্যমাণ বইটি গড়পড়তা অনুবাদ নয়। স্বাধীন অনুবাদ। জেমস রিকার্ডসের 'দ্য নিউ কেস ফর গোল্ড'-এর ছায়া অনুবাদ বলা চলে।

মৌলিকভাবে লেখকের কাঠামো অনুসৃত হয়েছে। কিন্তু বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে নতুন নতুন তথ্য সন্নিবেশিত হয়েছে। সংযোজিত তথ্যের উৎস উল্লেখ করা হয়েছে। আলোচনার সূত্র মেলাতে প্রথম অধ্যায়টি সংযুক্ত করা হয়েছে। যথারীতি তথ্য-উপাত্তের রেফারেন্স রয়েছে।

আশা করি বইটি আপনার চিন্তাজগতে নতুন দিগন্ত উন্মোচন করবে, ভাবনার দুয়ার খুলে দেবে। এবং অবশ্যই প্রথাগত চিন্তার ভিত কাঁপিয়ে দেবে। ছোট্ট কলেবরের বইটি এক বৈঠকে পাঠ ছেড়ে ওঠা দুষ্কর।

বাংলা ভাষায় এই বিষয়ে এটিই প্রথম অ্যাকাডেমিক কাজ।

ভুলত্রুটি মার্জনীয়। অবগত করলে কৃতজ্ঞ থাকব এবং সংশোধন করে নেব।

দোয়ার মুখাপেক্ষী

রাকিবুল হাসান

তাকমিল, মাদরাসা বাইতুল উলুম ঢালকানগর

ইফতা, জামিয়াতু মাআরিফ আল ইসলামিয়া, ঢাকা

শিক্ষার্থী, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

rakibulhasanduir@gmail.com

০১-২৯-২০২২

প্রথম অধ্যায়

এক চুমুকে মুদ্রার ইতিহাস

বিনিময় প্রথা

ধারণা করা হয় আদিম-সমাজে মুদ্রার প্রচলন ছিল না; বরং বলা ভালো প্রয়োজন ছিল না। সবাই যার যার নিত্যপ্রয়োজনীয় খাদ্য নিজেই উৎপাদন করত। কারও সাথে কোনো কিছু বিনিময়ের প্রয়োজন ছিল না, ফলে বিনিময়ের মাধ্যম হিসেবে মুদ্রার প্রয়োজনও ছিল না। ধীরে ধীরে সমাজ বড় হয়েছে, উন্নত হয়েছে, কর্মবিভাজন হয়েছে। কর্মবিভাজন ও শ্রেণিবিন্যাসের ফলে নিজের প্রয়োজনীয় সবকিছু উৎপাদন সবার পক্ষে সম্ভব ছিল না। রাখালের পক্ষে কৃষিকাজ সম্ভব না, যেমন সম্ভব না কৃষকের পক্ষে মৃৎপাত্র নির্মাণ।

প্রয়োজনের তাগিদে গড়ে ওঠে barter বা বিনিময় প্রথা। পণ্যের বিনিময়ে পণ্য আদানপ্রদান। কৃষকের চাল দরকার, হয়তো দুধ দিয়ে চাল নিচ্ছেন। কিন্তু সমস্যা দেখা দেয় তখন, যখন চাল বিক্রেতার দুধ প্রয়োজন নেই। সবক্ষেত্রেই এমন সমস্যা দেখা দিতে শুরু করে। ফলে মুদ্রার প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়, যদ্বারা সব ক্রেতা-বিক্রেতা লেনদেন করতে পারবে। এ থেকে গড়ে ওঠে পৃথিবীর প্রাচীনতম মুদ্রাব্যবস্থা। অঞ্চলভেদে মুদ্রাব্যবস্থায় ভিন্নতা ছিল।

সাধারণত মুদ্রার ক্ষেত্রে কিছু বিষয় লক্ষ রাখতে হতো। আকার, মূল্য ও গুণাগুণের ক্ষেত্রে সামঞ্জস্যপূর্ণ এবং দীর্ঘদিন রক্ষণাবেক্ষণযোগ্য বস্তুগুলো মুদ্রা হিসেবে জনপ্রিয়তা লাভ করে।

কড়ি

টাকাকড়ি, বা কপর্দকশূন্য শব্দগুলো বাংলায় হরহামেশা ব্যবহৃত হয়। টাকার বিষয়টা না হয় বুঝা গেল, কিন্তু কড়ি? কড়ি হচ্ছে প্রাচীনতম মুদ্রা। শামুক-ঝিনুকের খোলস। ১২০০ খ্রিষ্টপূর্বাব্দে এর প্রচলন শুরু হয়। বিশেষত সমুদ্রোপকূলের সভ্যতাগুলোতে। কড়ি ব্যবহারের বেশ কিছু সুবিধা ছিল। এগুলো প্রাকৃতিকভাবে উৎপন্ন, আকার ও গুণাগুণের ক্ষেত্রে সামঞ্জস্যপূর্ণ। পাশাপাশি দীর্ঘদিন সংরক্ষণযোগ্য। অর্থের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হচ্ছে সংরক্ষণযোগ্যতা। টাকা রেখে

দিলেন, কয়েক বছর পর যদি দেখেন আলুর মতো সব পচে গেছে, অনুভূতিটা নিশ্চয় সুখকর হবে না। শামুক-ঝিনুক সমুদ্রোপকূলে সহজলভ্য ছিল বিধায় দক্ষিণ এশিয়া এবং আফ্রিকায় এর ব্যাপক প্রচলন ঘটে। ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে ইউরোপেও কড়ির ব্যবহার ছড়িয়ে পড়েছিল। ফিজিসহ বেশ কিছু দ্বীপে তিমির দাঁত মুদ্রা হিসেবে ব্যবহৃত হতো।

ভারতবর্ষে এবং বাংলায় প্রাচীন ও মধ্যযুগে কড়ি ব্যবহৃত হতো। সংস্কৃতে কড়িকে বলা হয় কপর্দক। বড় বড় শহর ও বাণিজ্যকেন্দ্রগুলোতে স্বর্ণ-রুপার মুদ্রা প্রচলিত থাকলেও এগুলোর ব্যবহার সেখানেই সীমিত ছিল। গ্রামাঞ্চলে কড়িই ছিল লেনদেনের মাধ্যম। ফলে মধ্যযুগীয় ঐতিহাসিক এবং রাষ্ট্রনিয়ন্ত্রকরা কর আদায়ের মানদণ্ড হিসেবে কড়িকেই বেছে নিয়েছিলেন। আকবরের উপদেষ্টা আবুল ফজলের রচনাবলিতেও কড়িকে বাজারমূল্যের মানদণ্ড হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে।[১]

পয়সা

পৃথিবীর সব সভ্যতায়—গ্রামে এবং বাণিজ্যকেন্দ্রে—কড়ি বা এই জাতীয় প্রাকৃতিক মুদ্রা ব্যবহৃত হতো না। যখন প্রাকৃতিক মুদ্রা প্রচলিত ছিল, তখন বা তারও পূর্ব থেকে পৃথিবীর নানা প্রান্তে ধাতব মুদ্রার প্রচলনও ছিল। ঐতিহাসিকদের মতে প্রথম পয়সার ব্যবহার শুরু হয় খ্রিষ্টপূর্বাব্দ ২০০০ সালে, ব্যবিলনে। কিন্তু সরকারি মুদ্রা বা কয়েনের সূচনা হয় খ্রিষ্টপূর্ব সপ্তম শতাব্দীতে। লিডিয়া রাজ্যে, যা বর্তমান তুরস্কের অন্তর্গত, খ্রিষ্টপূর্ব ৬১০ সালের দিকে সরকারি কয়েনের প্রচলন শুরু হয়। যা ছিল লিডিয়ার রাজা ক্রোয়েসাস কর্তৃক প্রবর্তিত। ধীরে ধীরে আশেপাশের রাজ্যেও ছড়িয়ে পড়ে। কয়েনগুলোতে রাষ্ট্রীয় নানা প্রতীক অঙ্কিত থাকত। লিডিয়ার প্রাথমিক মুদ্রাগুলো স্বর্ণ-রুপার সংমিশ্রণে তৈরি হতো। পরবর্তী সময়ে স্বর্ণ ও রুপার আলাদা আলাদা কয়েন চালু করা হয়।

কাগুজে অর্থ

চিনে কাগজের আবিষ্কার হয়েছিল। ফলে ধারণা করা হয় কাগুজে টাকার ব্যবহারও সম্ভবত চীন থেকেই শুরু হয়। কাগুজে টাকার পূর্বে এবং সামসময়িককালে চামড়ার টাকাও ব্যবহৃত হতো। বিশেষত রোম সাম্রাজ্য এবং রাশিয়া-সহ ইউরোপের বিভিন্ন দেশে চামড়ার টাকার প্রমাণ মেলে। কাগুজে টাকা হচ্ছে প্রথম প্রমিসারি মানি বা ফিয়াট কারেন্সি। ৯৯৭ থেকে ১০২২ সাল নাগাদ কাগুজে টাকার উদ্ভব হয় এবং আঠারো ও উনিশ শতকে বিশ্বব্যাপী কাগুজে টাকার ব্যাপক প্রচলন শুরু হয়।

---

[১] বাংলাপিডিয়া, https://fliplink.io/Fz৫৪K

শুরুর দিকে কাগুজে টাকা মূলত স্বর্ণ-রুপার প্রতিনিধি ছিল। অর্থাৎ যাদের নিকট অনেক স্বর্ণ-রুপা বা দিনার-দিরহাম ছিল, যেহেতু এগুলো বহন করা কাগজের তুলনায় কিছুটা শ্রমসাধ্য, পাশাপাশি ছিল নিরাপত্তার প্রশ্ন, তাই বাজারের বৃহৎ কোনো স্বর্ণকার বা ব্যবসায়ীর নিকট স্বর্ণ-রুপা গচ্ছিত রাখত। বিনিময়ে তারা একটা কাগজে লেখে দিত যে আমার নিকট এই কাগজ বহনকারীর এত পরিমাণ স্বর্ণ রক্ষিত আছে। এই সার্টিফিকেট বহনকারী কেনাবেচার সময় দোকানে গিয়ে স্বর্ণ এনে দেওয়ার পরিবর্তে এই কাগজ দিয়ে দিত, যদি প্রয়োজন হয় কাগজ দেখিয়ে স্বর্ণ তুলে নিতে পারবে। বর্তমান সময়ের টাকার গায়ে লেখা থাকে—চাহিবামাত্র ইহার বাহককে ১০ টাকা দিতে বাধ্য থাকবে, এর অর্থ হচ্ছে এই কাগজ বহনকারীকে সেই স্বর্ণকার বা ব্যবসায়ী ১০ টাকা সমপরিমাণ স্বর্ণ-রুপা দিতে বাধ্য থাকবে।

এটা সে সময়ের কথা। বর্তমানে এই টাকার পেছনে কোথাও কোনো স্বর্ণ রক্ষিত নেই। ফলে লেখাটা জাস্ট ফ্যাশন। এভাবে দেখা গেল স্বর্ণকারদের হাতে প্রচুর স্বর্ণ জমা হচ্ছে, মানুষ কাগজেই লেনদেন করছে, বাস্তব স্বর্ণ তুলতে আসছে খুবই কম। তখন তারা আরও বেশি বেশি কাগজ ছাড়তে শুরু করল। এক ভরি স্বর্ণের বিপরীতে হয়তো দেড় ভরির কাগজ ছেড়েছে। কারণ, দেড় ভরি স্বর্ণ কেউ একসঙ্গে তুলতে আসবে না।

অন্যদিকে স্বর্ণকাররা আবার এসব স্বর্ণ বড় বড় ব্যবসায়ীদেরকে ঋণ দিতে শুরু করে। এভাবেই আধুনিক ব্যাংকিংব্যবস্থার পূর্বসূরির জন্ম হয়। পরবর্তী সময়ে সরকার আইন করে স্বর্ণ গচ্ছিত রাখা এবং এর বিপরীতে কাগজ ছাপার অনুমতি শুধু ব্যাংকগুলোতে সীমাবদ্ধ করে দেয়, আরও পরে এই ক্ষমতা শুধু কেন্দ্রীয় ব্যাংকের নিয়ন্ত্রণে চলে যায়।

যেহেতু কাগজগুলো প্রকৃত 'অর্থ' নয়; বরং অর্থের প্রতিনিধিমাত্র, তাই এগুলোকে বলা হতো প্রমিসারি মানি বা অঙ্গীকারাবদ্ধ অর্থ। অর্থাৎ এই কাগজ জমা দিলে তাকে সমপরিমাণ 'প্রকৃত অর্থ' (স্বর্ণ-রুপা) দিতে হবে। যখন থেকে কাগুজে অর্থের বিপরীতে স্বর্ণ-রুপা সংরক্ষিত রাখার বিধান বাতিল হয়ে যায়, তখন থেকে কাগজ শুধুই ফিয়াট কারেন্সি বা বিহিত মুদ্রা। বিহিত মুদ্রা বলা হয় যা নির্দিষ্ট দেশের সরকারের আদেশবলে মুদ্রা হিসেবে ব্যবহৃত হয়। যেমন : টাকা, রুপি, ডলার ইত্যাদি।

গোল্ড স্ট্যান্ডার্ড

কাগুজে টাকার প্রচলন শুরু হওয়ার পর দেখা গেল সরকারগুলো যথেচ্ছ টাকা ছাপছে। এখনো ছাপে। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে তৎকালীন সুপার পাওয়ার যুক্তরাজ্য ১৮২১ সালে গোল্ড স্ট্যান্ডার্ড ঘোষণা করে। তবে ব্রিটেন নিজস্বভাবে ১৭১৭ সাল থেকেই গোল্ড স্ট্যান্ডার্ড মেনে চলত।[১] ১৮২১ সালে অন্যদের জন্যও এই ব্যবস্থা উন্মুক্ত করে দেওয়া হয়। তারপর থেকে টাকা ছাপানোর জন্য নির্দিষ্ট পরিমাণ একটা স্বর্ণের মজুত থাকতে হতো। কী পরিমাণ স্বর্ণের বিপরীতে কী পরিমাণ টাকা ছাপা যাবে তা সময়ে সময়ে পরিবর্তিত হয়েছে। অবশেষে ১৯৭১ সালে এই পদ্ধতি বাতিল হয়ে যায়। ফলে ১৯৭১ সালের পর থেকে টাকা শুধুই টাকা, এর বিপরীতে কিছুই নেই। জাস্ট এক টুকরো কাগজ। কাগুজে টাকার পর আসে ক্রেডিট কার্ড। এখন ডিজিটাল মুদ্রা বিটকয়েনও জনপ্রিয়তা পাচ্ছে।[২]

টার্নিং পয়েন্টস : জিনোয়া কনফারেন্স

অর্থব্যবস্থার ইতিহাসে কিছু ঘটনা বেশ গুরুত্বপূর্ণ। এর মাঝে রয়েছে ১৯২২ সালের জিনোয়া কনফারেন্স। জিনোয়া ইতালির একটি শহর। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পূর্ব পর্যন্ত গোল্ড স্ট্যান্ডার্ড চলমান ছিল। যুদ্ধব্যয় বহন করতে গিয়ে ইউরোপের অনেক দেশ গোল্ড স্ট্যান্ডার্ড ত্যাগ করে। যুদ্ধে ইউরোপের প্রাণহানি এবং সম্পদহানীর পরিমাণও ছিল অকল্পনীয়। পাশাপাশি যুদ্ধ-পরবর্তী ইউরোপে দুটি 'বিচ্ছিন্ন' দেশ ছিল—জার্মানি এবং রাশিয়া। জার্মানি প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরাজিত শক্তি এবং কালপ্রিট একঘরে ছিল। আর রাশিয়াতে ১৯১৭ সালে বলশেভিক বিপ্লবের ফলে ইউরোপের অন্যান্য অংশ থেকে রাজনৈতিকভাবে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। এসব ইস্যু সমাধান করার জন্য ১৯২২ সালে ইতালির জিনোয়াতে একটি কনফারেন্স অনুষ্ঠিত হয়। ইউরোপের ৩০টিরও অধিক দেশ এতে অংশগ্রহণ করে। কনফারেন্সের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল গোল্ড স্ট্যান্ডার্ড পুনর্বহাল করা এবং রাশিয়ার সাথে ইউরোপের লেনদেননীতির সুরাহা করা।

কনফারেন্স থেকে নতুন 'গোল্ড এক্সচেঞ্জ স্ট্যান্ডার্ড' ঘোষিত হয়। যুদ্ধপূর্ব 'গোল্ড স্ট্যান্ডার্ড' থেকে বেশ কিছু ক্ষেত্রে 'গোল্ড এক্সচেঞ্জ স্ট্যান্ডার্ড' ছিল ভিন্নতর। সবচেয়ে বড় পার্থক্য ছিল—পূর্বে কেন্দ্রীয় ব্যাংকগুলো শুধু স্বর্ণ-রুপা মজুত করত। এখন থেকে তারা সুনির্দিষ্ট কিছু বিদেশি কারেন্সিও (রাষ্ট্রীয় মুদ্রা) মজুত করবে।

---

[১] James Rickards, *Currency wars : the making of the next global crisis,* New Yourk, Penguin, 2011, p. 51

[২] এই অংশের বাকি সমস্ত তথ্য এনসাইক্লোপিডিয়া অব ব্রিটানিকা থেকে সংগৃহীত, https://fliplink.io/pr5h8

চাইলে এই মজুদের 'বিনিময়ে' সেই দেশ থেকে স্বর্ণ সংগ্রহ করতে পারবে। এজন্যই এর নামে 'এক্সচেঞ্জ' অংশটুকু যুক্ত হয়েছে। স্বর্ণের রেট আউন্সপ্রতি ২০.৬৭ ডলারে ধরে রাখার দায়িত্ব পড়ে যুক্তরাষ্ট্রের ঘাড়ে। অন্যান্য দেশ চাইলে স্বর্ণের পাশাপাশি ডলারও মজুত করতে পারে।

দ্বিতীয় পরিবর্তন ছিল—দেশগুলো এখন অল্পস্বল্প স্বর্ণ এক্সচেঞ্জ করতে পারবে না। ডলার বা অন্য কারেন্সি দিয়ে স্বর্ণ বিনিময় করতে চাইলে একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ করতে হবে—সর্বনিম্ন চারশ আউন্সের বার। তৎকালীন বাজারমূল্য ৮২৪৮ ডলার, বর্তমান বাজারমূল্যে যা প্রায় ১ লাখ ১০ হাজার ডলার। ফলে দেখা গেল কেন্দ্রীয় ব্যাংক, বড় বড় বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানই শুধু এক্সচেঞ্জ করতে পারছে।

গোল্ড এক্সচেঞ্জ স্ট্যান্ডার্ডে কাগুজে অর্থ স্বর্ণের বিকল্প হয়ে ওঠে। আর স্বর্ণের ঠাঁই হয় কেন্দ্রীয় ব্যাংকের ভল্টে। এভাবে মানুষের হাত থেকে স্বর্ণ খসে যায়। এই নীতি বহাল রেখে ব্রিটেন ১৯২৫ সালে গোল্ড স্ট্যান্ডার্ড এ্যাক্ট জারি করে।[১] প্রথম বিশ্বযুদ্ধোত্তর অর্থব্যবস্থাকে আমরা জিনোয়া সিস্টেম নামে অভিহিত করতে পারি।

ব্রেটন উডস

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের মতো দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরও ইউরোপের ত্রাহি ত্রাহি দশা হয়েছিল। বরং দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ধ্বংসলীলা ছিল আরও ভয়াবহ। কারণ প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর ইউরোপীয়দের বিধ্বংসী ক্ষমতা বহুগুণ বেড়েছে। সেসব নিয়ে জান্তব জিঘাংসায় খুনের নেশায় মেতে উঠেছিল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে প্রায় ৬ কোটি মানুষ প্রাণ হারিয়েছে। তন্মধ্যে ইউরোপীয়দের সংখ্যা ছিল ২ কোটি। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের দ্বিগুণেরও বেশি।

যুদ্ধোত্তর ইউরোপ আক্ষরিক অর্থেই ছিল ইট-সুড়কির ভাগাড়। বার্লিন, প্যারিস-সহ অভিজাত সব শহর তখন ভূতুড়ে নগরী। রাস্তাঘাট নেই, শহর নেই, গ্রামও নেই। ৬ কোটি ইউরোপীয় ভিটেমাটি হারিয়েছে। দেশ ছেড়েছে আড়াই কোটির অধিক। ১৯৪৫ সালে এক সপ্তাহে শুধু জার্মানির একটি ক্যাম্পেই শরণার্থী এসেছিল ৪০ হাজার![২]

দ্বিতীয়ত, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পর্যন্ত ইউরোপীয় দখলদাররা এশিয়া—আফ্রিকা-সহ গোটা বিশ্বকেই উপনিবেশ বানিয়ে ফেলেছিল। দখলদারত্বের প্রধান মাধ্যম ছিল নৌশক্তি। দখলাভিযান থেকে শুরু করে দাস-ব্যবসা কিংবা সম্পদ লুণ্ঠন সবকিছুই

---

[১] James Rickards, *Currency wars : the making of the next global crisis,* New Yourk, Penguin, 2011, p. 70

[২] এনসাইক্লোপিডিয়া অব ব্রিটানিকা, https://fliplink.io/yw8tI

হত নৌরুটে। কিন্তু দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে জাপান—আমেরিকা, জার্মানি—ইংল্যান্ডের ভয়াবহ নৌযুদ্ধের ফলে যুদ্ধের পর ইউরোপীয়দের নৌবহর বলতে তেমন কিছু অবশিষ্ট থাকেনি। ফলে তাদের লুণ্ঠন-সামর্থ্য তীব্রভাবে হ্রাস পায়। ব্যবসা-বাণিজ্যের মুখ থুবড়ে পড়ে। এমনকি উপনিবেশগুলো ধরে রাখতে যে পরিমাণ সেনা-অর্থ প্রয়োজন, তাও ছিল না। ফলে উপমহাদেশ-সহ পৃথিবীর প্রান্তে প্রান্তে স্বাধীনতা আন্দোলন দুর্নিবার হয়ে ওঠে।

তবে, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে একটি দেশ সবচেয়ে বেশি লাভবান হয়েছে—আমেরিকা। অর্থনৈতিক, সামরিক, প্রযুক্তি-সহ সর্বক্ষেত্রে আমেরিকা তখন সর্বেসর্বা। ইউরোপ মার্কিন ঋণের ভারে জর্জরিত। তাদের নৌবহর উধাও। কিন্তু প্রশান্ত আর আটলান্টিক মহাসাগরের বুক দাপিয়ে বেড়াচ্ছে মার্কিন নৌবহর। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর মার্কিনীদের দৃষ্টিভঙ্গি ছিল—ইউরোপীয়দের যুদ্ধে আমাদের জড়ানো উচিত হয়নি। ফলে তারা আইসোলেশনিজম বা নিঃসঙ্গতাবাদে ফিরে যায়। কিন্তু দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর তারা সে পথে হাঁটেনি। বরং ইউরোপীয় সাম্রাজ্যবাদ হটিয়ে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের উত্থান ঘটে। মূলত দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর যদি আমেরিকা ইউরোপের পুনর্গঠনে হাত না দিত, আজকের ইউরোপ হয়তো আফ্রিকার চেয়ে ভিন্নতর হতো না।

বিশ্বযুদ্ধোত্তর অর্থব্যবস্থা নির্ধারণকল্পে ১৯৪৪ সালের জুলাইতে আমেরিকা একটি সম্মেলন ডাকে। এই ডাকে সাড়া দিয়ে যুদ্ধরত ৪৪টি দেশের প্রতিনিধিরা যুক্তরাষ্ট্রের নিউহ্যাম্পশায়ারের ব্রেটন উডসে সম্মিলিত হয়। যুদ্ধ-পরবর্তী অর্থব্যবস্থা এখান থেকে গড়ে উঠেছে বিধায় একে বলা হয় ব্রেটন উডস সিস্টেম।

এর মূল বিষয়গুলো ছিল স্বর্ণকে মানদণ্ড ধরে একটি নতুন গোল্ড স্ট্যান্ডার্ড গড়ে তোলা। তবে এর এক্সচেঞ্জ রেট ছিল ফিক্সড। ডলারের বিপরীতে স্বর্ণ ছিল। অন্যসব দেশের মুদ্রা ছিল ডলারনির্ভর। অর্থাৎ ডলার-বেজড গোল্ড স্ট্যান্ডার্ড। সব দেশের মুদ্রার বিপরীতে আছে ডলার, ডলারের বিপরীতে আছে স্বর্ণ, ফলে পরোক্ষভাবে সব দেশের মুদ্রাই স্বর্ণের সাথে সম্পৃক্ত। যদি অন্য দেশ তাদের হাতে থাকা ডলার ভাঙিয়ে স্বর্ণ সংগ্রহ করতে চায়, আমেরিকা দিতে বাধ্য থাকবে। এভাবে ডলার হয়ে ওঠে গ্লোবাল রিজার্ভ কারেন্সি। বিশ্বমুদ্রা।

বিশ্ব অর্থব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণের জন্য ব্রেটন উডস থেকে দুটি প্রতিষ্ঠানের জন্ম হয়। এগুলোকে বলা হয় ব্রেটন উডস ইন্সটিটিউটস। প্রথমটি বিশ্বব্যাংক, এর অফিশিয়াল নাম—International Bank for Reconstruction and Development। দ্বিতীয়টি হচ্ছে আইএমএফ (International Monetary Fund)। বর্তমানে আরও পাঁচটি প্রতিষ্ঠানের সমন্বয়ে গড়ে উঠেছে ওয়ার্ল্ড ব্যাংক

গ্রুপ। ব্যাংকের নাম থেকেই বুঝা যাচ্ছে এটি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল মূলত বিধ্বস্ত ইউরোপ পুনর্গঠনে ঋণ সহায়তা প্রদান করার জন্য।[১]

আর আইএমএফের প্রধান দায়িত্ব ছিল আন্তর্জাতিক অর্থব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণ করা। কারেন্সি বিনিময়ের হার স্থিতিশীল রাখা এবং আন্তর্জাতিক লেনদেনে সহায়তা করা। যেহেতু ব্রেটন উডস অর্থব্যবস্থায় এক্সচেঞ্জ রেট ছিল ফিক্সড, তাই কোনো দেশ নিজ কারেন্সির দর কমবেশি করতে চাইলে আইএমএফের অনুমতি নিতে হতো। যেন ১৯২৯ সালের মতো অবস্থা পুনরায় তৈরি না হয়।[২]

তৃতীয় আরেকটি চুক্তি হয়েছিল ব্রেটন উডসে—জেনারেল অ্যাগ্রিমেন্ট অন ট্যারিফস অ্যান্ড ট্রেড (GATT)। এর উদ্দেশ্য ছিল মুক্ত বাণিজ্য ও মুক্ত বাজার নিশ্চিত করা। ফলে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধত্তোর অর্থব্যবস্থাকে বলা হয় ব্রেডন উডস অর্থব্যবস্থা। বর্তমানে যদিও এর গুরুত্বপূর্ণ বহু অংশ খসে গেছে, কিন্তু ব্রেটন উডস ইন্সটিটিউটগুলো বিশ্ব—অর্থব্যবস্থায় এখনো প্রভাবশালী ও প্রাসঙ্গিক।

পেট্রোডলার

১৯৭১ সালে ব্রেটন উডস ভেঙে পড়ে। এই ব্যবস্থার অধীনে যুক্তরাষ্ট্র অঙ্গীকারাবদ্ধ হয়েছিল যে ডলারের বিপরীতে চাইলে স্বর্ণ সংগ্রহ করা যাবে। ফলে প্রচুর পরিমাণ স্বর্ণ আমেরিকার হাতছাড়া হয়ে যায়। ইউরোপীয় অনেক দেশ, বিশেষত ফ্রান্স দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে খোয়া যাওয়া স্বর্ণ পুনরুদ্ধারকল্পে ডলার ভাঙিয়ে স্বর্ণ নিয়ে নিচ্ছিল। বাধ্য হয়ে ১৯৭১ সালে মার্কিন প্রেসিডেন্ট রিচার্ড নিক্সন ডলারকে স্বর্ণে কনভার্ট করার সুযোগ বন্ধ করে দেন। ফলে পরোক্ষ গোল্ড স্ট্যান্ডার্ডভিত্তিক ব্রেটন উডস অর্থব্যবস্থা ভেঙে পড়ে। তারপর থেকে বিশ্ব-অর্থব্যবস্থা 'ফ্লোটিং এক্সচেঞ্জ রেট'-ভিত্তিক।

বর্তমানে সব কাগুজে মুদ্রা। এর পেছনে কোনো সম্পদ নেই, কোথাও নেই। কারেন্সিগুলো টিকে আছে শুধু মানুষের আস্থার ভিত্তিতে। কোনো কারণে কাগজের এই টুকরোগুলোর ওপর মানুষের আস্থা চলে গেলে—অর্থব্যবস্থা ধসে পড়বে।

নিক্সনের ঘোষণায় গোটা পৃথিবী হতভম্ব হয়ে যায়। তাদের মর্মবেদনা এতই সুগভীর ছিল যে, এই ঘোষণাকে 'নিক্সন শক' নামে অভিহিত করা হয়। ১৯৭১ সালের পর থেকে বিশ্ব অর্থব্যবস্থায় ডলারের কোনো বিশেষ বৈশিষ্ট্য ছিল না। পাশাপাশি নিক্সন শকের পর থেকে ডলারের দরপতন চলতেই থাকে। এ সময় মার্কিন প্রেসিডেন্টরা

---

[১] https://www.worldbank.org/en/who-we-are

[২] HYPERLINK "https://www.imf.org/en/About/Factsheets/IMF-at-a-Glance

সৌদি আরবের সাথে আলোচনা শুরু করেন যেন সৌদি শুধু ডলারেই তেল বিক্রি করে। সৌদি-আমেরিকার 'তৈলাক্ত' সম্পর্কের সূচনা যদিও ১৯৪৫ সালে।[১] ১৯৭৪ সালে এটি গতি পায়। এ ক্ষেত্রে ১৯৭৩ সালের আরব-ইজরাইল যুদ্ধ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে।

আরব-ইজরাইল যুদ্ধে আমেরিকা ইজরাইলীয়দের পক্ষাবলম্বন করার ফলে ওপেক, যা তখন আরব রাষ্ট্রগুলোর প্রভাবাধীন ছিল, পশ্চিমাদের নিকট তেল রপ্তানি বন্ধ করে দেয়। হুহু করে তেলের দাম বাড়তে শুরু করে। একে তো ডলারের নিম্নগতি, তার ওপর তেলের ঊর্ধ্বগতিতে মার্কিনীদের বেশ নাজেহাল অবস্থা। সৌদির সাথে একাধিক চুক্তি—গোপনচুক্তির পর স্থির হয় যে, সৌদি আরব ডলার ছাড়া তেল বিক্রি করবে না। ফলে ওপেকের অন্যান্য সদস্য রাষ্ট্রও ডলারে তেল বিক্রি করতে শুরু করে। জন্ম হয় পেট্রোডলারের।

এরপর থেকে বিশ্বের যেকোনো দেশ তেল ক্রয় করতে চাইলে ডলারে ক্রয় করতে হয়। আন্তর্জাতিক বাজারে তেলের মূল্য নির্ধারিত হয় ডলারে। এভাবে ব্রেটন উডসের ফিক্সড গোল্ড স্ট্যান্ডার্ড ভেঙে পড়ার পরও বৈশ্বিক রিজার্ভ কারেন্সি ডলার টিকে যায়। গোল্ড স্ট্যান্ডার্ড আর পেট্রোডলারের মাঝে পার্থক্য রয়েছে। অনেকে মনে করেন এখন বুঝি ডলারের বিপরীতে তেল আছে। আসলে তা নয়।

বরং পেট্রোডলার এবং ডলার—দুটি আলাদা মুদ্রা; যদিও বাস্তবে দুটিই মার্কিন ডলার। তো পার্থক্য কোথায়? পার্থক্য হচ্ছে তেলবিক্রির মূল্যবাবদ বিক্রেতা রাষ্ট্র যে ডলার সংগ্রহ করে তা পেট্রোডলার, বাকিসব ডলার শুধুই ডলার। পেট্রোডলার নয়। পেট্রোডলারের মাধ্যমে যুক্তরাষ্ট্র নিছক বিশ্ববাজারে টিকে গেছে তাই নয়; বরং অন্যান্য দিক থেকেও প্রভূত লাভবান হয়েছে। পেট্রোডলারের ফলে তেল বিক্রেতা দেশগুলোর হাতে প্রচুর পরিমাণ ডলার পুঞ্জিভূত হয়ে যায়। এগুলো পুনরায় যুক্তরাষ্ট্রেই বিনিয়োগ করা হয় কিংবা নিজ রাষ্ট্রের উন্নয়ন কর্মকাণ্ড মার্কিন প্রতিষ্ঠান দ্বারা করিয়ে বেতন ডলার পরিশোধ করা হয়। এই প্রক্রিয়াকে বলা হয় পেট্রোডলার রিসাইকল। রিসাইক্লিং এর ফলে একদিকে আমেরিকায় বিশাল-বিপুল বিনিয়োগ এসেছে, অপরদিকে তাদের শ্রমিকদের বেতন বৃদ্ধি পেয়েছে।

বর্তমানে পেট্রোডলারের অস্তিত্ব চ্যালেঞ্জের মুখে পড়ছে। রাশিয়া, চীনের মতো বড় বড় তেল উৎপাদনকারী দেশ ওপেকের সদস্য নয়। তারা স্বাধীনভাবে সিদ্ধান্ত নেয়। রাশিয়া, চীন, ভারত-সহ অনেক দেশ নিজস্ব মুদ্রায় তেল বিক্রির চেষ্টা করছে।[২]

---

[১] https://fliplink.io/kc4Na

[২] https://www.investopedia.com/terms/p/petrodollars.asp

চীন তো পেট্রোইয়ান (ইয়ান চীনের মুদ্রা) প্রচলনের চেষ্টাও করছে। এর কারণ হচ্ছে ডলারের মূল্য নানা কারণে উঠানামা করে। সাম্প্রতিক সময়ে এই উত্থানপতন তীব্রতর হচ্ছে। ফলে যেসব দেশের হাতে বিপুল পরিমাণ পেট্রোডলার থাকে, ডলারের মূল্য কমলে তাদের পেট্রোডলারের মূল্যও কমে যায়। সম্পদহানি হয়। তাই অনেক দেশ পেট্রোডলারের বিকল্প সন্ধানে ব্যস্ত। পেট্রোডলারের পতনের সাথে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অর্থনৈতিক দাদাগিরির 'শুভসমাপ্তি' নিশ্চিত হবে।

* * *

দ্বিতীয় অধ্যায়

বিশ শতক : মুদ্রাস্ত্র ও মুদ্রাযুদ্ধের ইতিবৃত্ত

'আমরা একটি বৈশ্বিক কারেন্সি ওয়ারের মাঝে আছি।'

—গুইডো ম্যানতেগা, ব্রাজিলের অর্থমন্ত্রী

২৭ সেপ্টেম্বর, ২০১০

মুদ্রাযুদ্ধ বলতে বোঝানো হয় কোনো দেশের নিজস্ব মুদ্রার মূল্যহ্রাসকরণ (ডিভ্যালুয়েশন)। মুদ্রাযুদ্ধ যদিও বৈশ্বিক, কিন্তু এর উৎস দেশের অভ্যন্তরীণ অর্থনীতি। যেকোনো দেশের অর্থনৈতিক উন্নতির চারটি উপাদান রয়েছে। ভোগ, বিনিয়োগ, সরকারি ব্যয় এবং রপ্তানি। প্রথম তিনটি দেশের অভ্যন্তরস্থ, চতুর্থটি বহির্বিশ্বের সাথে সম্পৃক্ত। সাধারণত দেশের অর্থনীতিতে মন্দাভাব দেখা দিলে সরকার এমন সব পলিসি গ্রহণ করে যেন মানুষ বেশি বেশি কনজাম্পশন বা ভোগ করতে শুরু করে। কারণ বেশি ভোগ মানে বেশি বিক্রি, বেশি উৎপাদন, বেশি কর্মসংস্থান এবং বেতন ও প্রফিটবাবদ মানুষের হাতে বেশি পরিমাণ অর্থ। এটি একটি চক্রের ন্যায়। কখনো প্রাইভেট সেক্টর বিনিয়োগ করতে ব্যর্থ হলে সরকার নিজেই বিনিয়োগ করে কর্মসংস্থান বৃদ্ধি করে। বেতন-ভাতাবাবদ মানুষের হাতে অধিক টাকা এলে ভোগের পরিমাণও বাড়বে। প্রবৃদ্ধিচক্র শুরু হবে।

কিন্তু যখন প্রথম তিনটির কোনোটিই কাজে আসে না, তখন একমাত্র উপায় রপ্তানিবৃদ্ধি। রপ্তানিবৃদ্ধির অন্যতম হাতিয়ার হচ্ছে দেশের মুদ্রার মান কমিয়ে দেওয়া বা ডিফ্ল্যাশন ঘটানো। একটি উদাহরণের মাধ্যমে বিষয়টি ক্লিয়ার করা যাক। মনে করি, ১০ ডলার মূল্যে বাংলাদেশের কোনো এক গার্মেন্টস আমেরিকাতে টিশার্ট রপ্তানি করে। প্রতিডলারের দাম বাংলাদেশি টাকায় ৮০ টাকা। ফলে ১০ ডলার সমান ৮০০ টাকা।

যদি সহসাই টাকার মূল্য কমে যায়?

টাকার মূল্য হ্রাসের অর্থ হচ্ছে টাকার বিপরীতে ডলারের মূল্যবৃদ্ধি। ফলে আগে এক ডলার ছিল ৮০ টাকা, এখন ডলারের মূল্যবৃদ্ধির ফলে ১ ডলার ৯০ টাকা। বাংলাদেশি গার্মেন্টস মালিক আগে ১০ ডলার ভাঙিয়ে ৮০০ টাকা পেত, কিন্তু